بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুপম জীবন-চরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا

অর্থাৎ, **নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও পরকালের (সাক্ষাৎ সম্পর্কে) আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক হারে স্মরণ করে।** (সূরা আল্ আহযাব : ২২)

এরপর হুযূর (আই.) বিভিন্ন আঙ্গিকে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ তুলে ধরেন। আর এ বিবরণকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করতে পারি। যেমন—

প্রথম অংশ: মহানবী (সা.)-এর অনন্য নৈতিক গুণাবলী ও আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর ভালোবাসা।

পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ: পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর সুমহান নৈতিক চরিত্রের সাক্ষ্য দেয়। কেউ একজন একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং অনুপম আদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) প্রতিউত্তরে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি পবিত্র কুরআন পড়ো নি? আল্লাহ্ স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيۡمٍ অর্থাৎ, **'আর নিশ্চয়ই তুমি এক মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।'** (সূরা আল্ কালাম: ৫)। হুযূর আনোয়ার (আই.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তাঁকে মানবজাতির জন্য এক **'পূর্ণাঙ্গ আদর্শ'** নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ— কেবল তাঁর কথা মানাই যথেষ্ট নয়, বরং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। ****

অতুলনীয় সামাজিক স্বীকৃতি: পার্থিব জগতে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার বা কমিটি পুরস্কার দেয়, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে পুরো জাতি একমত হয়ে তাঁকে নবুয়্যতের আগেই **'সত্যবাদী'** (আস্ সাদিক) এবং **'বিশ্বস্ত'** (আল্ আমীন) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তিনি এমন এক মানদণ্ডে পৌঁছেছিলেন যা মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।

আল্লাহ্‌র ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: মহানবী (সা.) তাঁর সারা জীবন আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় অতিবাহিত করেছেন। এমনকি যুদ্ধ, আক্রমণ বা নতুন শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মতো বিশাল দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা প্রদর্শন করেন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **মহানবী (সা.) বন্য মানুষকে প্রথমে মানুষে পরিণত করেছেন, এরপর তাদের শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন এবং তারপর তিনি তাদেরকে খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত করেছেন।** এটি অনেক বড়ো একটি কাজ ছিল। তিনি (সা.) অর্ধেক রাত নামাযে কাটিয়ে দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, **'আফালা আকুনু আবদান শাকুরা'** অর্থাৎ, **আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?** তিনি শিখিয়েছেন, আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নেই, বরং আল্লাহ্ আমাদের যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমাদের ইবাদত করা উচিত।

আল্লাহর বাণীর প্রতি অনুরাগ: পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনলে মহানবী (সা.)-এর চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। বিশেষত সেই আয়াতগুলো শোনার সময় যেগুলোতে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে স্মরণ করানো হয়েছে। একবার, মহানবী (সা)-এর নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) পবিত্র কুরআনের একটি অংশ তিলাওয়াত শুরু করেন এবং সূরা নিসার এ আয়াতে উপনীত হলে অর্থাৎ, **"অতএব তখন কী অবস্থা হবে— যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের সবার বিষয়ে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?"** (৪:৪২) এটি শোনার পর, মহানবী (সা.) হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে থামতে বলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) তিলাওয়াত বন্ধ করে দেখতে পান মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঝড়ছে। হুযূর (আই.) বলেন, কারণ! এই আয়াত শুনে তিনি তাঁর নিজের জাতির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, পাছে তারা এমন কিছু করে না বসে যার জন্য তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়। তাই আমাদের এমন কাজ করার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত যা মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্মত।

নামায ও জামা'তের গুরুত্ব: মহানবী (সা.) নামাযের ক্ষেত্রে এতটাই যত্নবান ছিলেন যে, তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময় যখন তিনি হাঁটতে পারছিলেন না, তখনও দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন। তিনি দ্রুত ও দায়সারা গোছের নামায পড়তে বারণ করেছেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে আছে, এক ব্যক্তিকে তিনি (সা.) একই নামায কয়েকবার পড়ান এবং তাকে শিখিয়ে দেন, কীভাবে ধীর স্থির হয়ে নামায পড়তে হয়। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট বা লৌকিকতা করাও তিনি পছন্দ করতেন না। যেমন, একবার তিনি মসজিদে একটি রশি ঝোলানো দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জানতে পারেন, হযরত যয়নব (রা.) নামায পড়তে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই রশি ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন। একথা শুনে তিনি তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন, শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী ইবাদত করা উচিত।

দ্বিতীয় অংশ : শিক্ষক হিসেবে তাঁর আদর্শ ও ধর্মীয় নিষ্ঠা

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিরকের বিরোধিতা: নামায পড়ার সময় বিশেষ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হাততালি না দিয়ে তিনি (সা.) **'সুবহানাল্লাহ্'** বলার নির্দেশ দেন। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিষয়ে তিনি আপোষহীন ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগে সতর্ক করেছিলেন যাতে কেউ তাঁর সমাধিকে মাজারে পরিণত না করে, কেননা এটি মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

নম্রতা ও ধৈর্য: মহানবী (সা.) ছিলেন পরম বিনয়ী এবং ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি বলতেন, নিজের আমালের জোরে নয়, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। খোদা তা'লার প্রতি তাঁর বিনয় প্রদর্শনের এরূপ অবস্থা ছিলো যে, যখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো আপনার কর্মের মাধ্যমে খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভ করবেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর সনদ প্রদান করেছেন এবং আপনার চারিত্রিক আদর্শের প্রশংসা করেছেন এবং আপনার জীবনার্দশকে মুসলমানদের আমলের একটি মানদণ্ড আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, না না! আমিও খোদা তা'লার অনুগ্রহেই ক্ষমা লাভ করবো। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি একদিন মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলছিলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের দরুন জান্নাতে প্রবেশ করবে না; আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনিও কি আপনার কর্মের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, আমিও নিজ কর্মবলে জান্নাতে প্রবেশ

করতে পারবো না, তবে, খোদা তা'লার অনুগ্রহ ও দয়া যদি আমাকে আচ্ছাদিত করে নেয় তবেই এটি সম্ভব। **(বুখারী শরীফ)**

মহানবী (সা.) মানুষকে শেখাতেন, কোনো কষ্টের কারণে মানুষের মৃত্যু কামনা করা উচিত নয়, কারণ জীবন হলো পুণ্য বাড়ানোর এবং পাপ থেকে তওবা করার একটি সুযোগ। তিনি তাঁর কন্যা ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নসীহত করতেন এবং নিজেদের ভুল ও দুর্বলতা স্বীকার করার গুরুত্ব বোঝাতেন।

মানব ইন্দ্রিয়ের সঠিক ব্যবহার ও সহজ পথ অবলম্বন : তিনি (সা.) শিখিয়েছেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত চোখ, কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যবহার করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যা শোনা বা মন্দ কিছু দেখা থেকে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত সদাচরণ। তিনি (সা.) সর্বদা দু'টি পথের মধ্যে সহজটি বেছে নিতেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা কষ্ট নয় বরং সহজসাধ্যতা চান। তবে শর্ত হলো তা যেন পাপের দিকে পরিচালিত না করে।

তৃতীয় অংশ: পারিবারিক জীবন, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও উৎসর্গকৃত জীবন

আদর্শ স্বামী ও পারিবারিক আচরণ: মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও কোমল আচরণ করতেন। এমনকি স্ত্রীরা কঠোর ভাষায় কথা বললেও তিনি হাসিমুখে তা এড়িয়ে যেতেন। তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-কে আজীবন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন এবং তাঁর বান্ধবীদেরও সম্মান করতেন। একারণে অনেক সময় হযরত আয়েশা (রা.)-র মাঝে ঈর্ষারও বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

পরম ধৈর্য: মহানবী (সা.) শৈশব থেকেই অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। তাঁর চাচী তাঁর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করলেও তিনি কখনো অভিযোগ করেন নি। বরং পরবর্তীতে ক্ষমতাবান হওয়ার পর তিনি সেই আত্মীয়দের সাথে চমৎকার আচরণ করেন। এছাড়া তাঁর সাতটি সন্তান মারা গেলেও তিনি কখনো আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করেন নি।

সহনশীলতা ও দানশীলতা: তিনি (সা.) শত্রুদের প্রতিও অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। একজন ইহুদী এক বৈঠকে তাঁকে বার বার তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করে অসম্মান করলেও তিনি রাগ না করে হাসিমুখে তা গ্রহণ করেন এবং সাহাবীরা তাকে বাধা দিতে চাইলে তিনি তাদেরকে নিষেধ করেন। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি কখনো তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না এবং বারবার সাহায্যপ্রার্থীদেরও ধৈর্য সহকারে সাহায্য করতেন। কিন্তু কাউকে নিষ্ঠাবান মনে হলে তাকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো।

উপসংহার: মহানবী (সা.)-এর জীবন-চরিত আমাদেরকে শেখায় যে, কীভাবে একজন মানুষ বন্য-স্বভাবী থেকে শিক্ষিত মানুষ এবং পরিশেষে আল্লাহ্র প্রিয় মানুষে পরিণত হতে পারে।

মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ছিল একটি স্ফটিক স্বচ্ছ ঝরনার মতো, যা থেকে প্রবাহিত প্রতিটি ধারা মানুষকে পবিত্র করে। তাঁর জীবন একটি বৃক্ষের মতো যার ছায়ায় সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ আশ্রয় পেয়েছে, আর যার ফল হলো শান্তি, ধৈর্য এবং আল্লাহ্র প্রতি অবিচল ভালোবাসা। **আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ, ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।**

পরিশেষে, হুযূর (আই.) জামা'তের দু'জন একনিষ্ঠ সেবকের জানাযার নামায পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথমত, মওলানা লাইক আহমদ তাহের সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের প্রথম অধ্যক্ষ এবং খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত অনুগত একজন মিশনারী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ ফযল আহমদ সাহেব (রা.)-র পুত্র ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৮৩ বছর বয়সে ইংল্যান্ডে ইন্তেকাল করেন। তিনি দেশে ও বিদেশের মাটিতে মোট ৫৯ বছর জামা'তের মূল্যবান সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আর অপরজন হলেন, মালি জামা'তের সেগু রিজিওয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সেগা জালু সাহেব। তিনি ১৯১৬ সালে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী, যিনি আর্থিক কুরবানীতে সদা অগ্রণী ছিলেন। তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের পর হুযূর (আই.) আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)